অধ্যায় ২ : আধুনিক বাংলা কবিতা-২

বিন্যাসক্রম

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচিতি

২.৩ বাংলা আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

২.৪ আট বছর আগের একদিন

২.৪.১ কবিতার মূল পাঠ

২.৪.২ কবিতাটির বিষয়বস্তু

২.৫ মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

২.৫.১ কবিতা পাঠ

২.৫.২ কবিতাটির বিষয়বস্তু

২.৬ পরাবাস্তববাদী কবিতার আলোকে জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন'

২.৭ 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার নামকরণের সার্থকতা বিচার

২.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

২.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

২.১০ অতিরিক্ত পঠন

২.১১ অগ্রগতির নির্ধারক প্রশ্নের উত্তর-সংকেত

২.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- আধুনিক কবিতার বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
- কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির মূল পাঠ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- কবি জয় গোস্বামীর অন্যতম কবিতা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার মূল পাঠ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- উভয় কবিতার বিশেষ সাহিত্যিক প্রবণতার দিকটি সম্পর্কে আত্মস্থ করতে সক্ষম হবেন।

২.২ পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যই কাব্যদেহে জাড়িত অর্থাৎ সাহিত্যিক পরিমণ্ডলে কবিতাই সব থেকে প্রাচীন উপাদান। তাই তার সম্পর্কে কৌতূহলেরও অন্ত নেই। বিশ্বসাহিত্যের প্রেক্ষাপট দেখলে দেখব যে একসময় কবিদের বিরুদ্ধে দেশ ত্যাগের ফরমান হয়, প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে কবিদের কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। অথচ পরবর্তীতে এই কবিতাই সাহিত্যের প্রথম ও অন্যতম আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী কবিতা হল বাচ্যার্থের অতিরিক্ত। পরিস্কার করে বললে কবিতা হল কবির এক নিজস্ব বিশিষ্ট ভাবের শৃঙ্খলাবদ্ধ আত্মপ্রকাশ যার মধ্য দিয়ে তিনি একটি অনুভবের জগত নির্মাণ করতে সক্ষম হন। যদি প্রশ্ন হয় এই অনুভবের জগত কোথা থেকে নির্মিত হবে তবে আমাদের ফিরে যেতে হবে কবিতার সৃষ্টি রহস্যের দিকে। কবিতার জন্ম শোক থেকেনা বিষাদময়তা থেকে। ক্রৌঞ্চ মিথুনের সেই বিষাদ থেকে ঋষি বাল্মীকির যে অভিব্যাক্ত, তার থেকে যে আত্মজিজ্ঞাসা 'কীমিদম্ ময়া' তাই তো আদি কবিতার প্রাথমিক রূপ।

পরবর্তীতে কবিরাও মনের মধ্যে এক বিশেষ বিষাদময়তার জগত নির্মাণ করেন, যার মধ্য থেকে উঠে আসবে কবিতার অনুপম সৃষ্টি। এজন্যই হয়ত পাশ্চাত্য কবি শেলী যথার্থই বলেছিলেন— "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." তবে এই বিষাদময়তাকে আশ্রয় করেই এক আশ্চর্য সৌন্দর্যের জগত নির্মাণ করা'ই আসলে কবিতার প্রধান দায়িত্ব। আর ভাবের এই বিশেষ দিক থাকার ফলেই হয়ত কবিতার সঙ্গে আবেগময়তা ও কল্পনার অকৃপণ যোগ।

২.৩ বাংলা আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ

সাহিত্যের একটি বহু চর্চিত বিষয় হল আধুনিক কবিতা কী? আসলে কবিতার পালাবদল তো গত দুই শতকে বারবার হয়েছে বা হচ্ছে। ফলত স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসছে আধুনিকতার প্রসঙ্গটি। আধুনিকতা এই ধারণাটিকে যদি সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে সময়ের একটি প্রতিচ্ছবি নিঃশ্চয়ই এসে পড়বে। এটা সকলেরই জানা যে, হাজার বছরের বাংলা কবিতার উত্তরাধিকারে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম একজন পরিপূর্ণ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আধুনিক কবি হিসাবে। কিন্তু আমরা দেখব যে, বাংলা কবিতার যে পালাবদল, কবিতার যে ভাষাবদল, কবিতার যে চিত্ররূপ বদল, কবিতার যে চিত্রকল্পের বদল সে সব কিন্তু রবীন্দ্রনাথে পৌঁছেই থেমে যায়নি। কারণ রবীন্দ্রনাথের সমকালে এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে এমনকি রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে তাঁর বহু প্রসারিত সময়ে এমন বিশেষ কিছু ঘটনা ঘটে যায় যার ফলে বাংলা কবিতা আবার নানাভাবে নিজেকে কালে কালে বদলে ফেলে। আর এই বদলের সাক্ষী থেকেছেন এইসব সময়ের আধুনিক কবিরা।

'আধুনিকতা' শব্দটির পেছনে একটি জটিলতা রয়েছে; কারণ 'আধুনিকতা' শব্দটি এসেছে 'অধুনা' শব্দ থেকে। আর এই 'অধুনা' শব্দটির অর্থ হল এই মুহূর্ত, কিন্তু আধুনিক কবিতাকে চিহ্নিত করতে গিয়ে হয়ত কেউই এই ভুল করবেন না যে আজকের কবিতা, গতকালের কবিতা, গত সপ্তাহের কবিতা, গত মাসের কবিতা, গত বছরের কবিতা কিংবা গত শতাব্দীর কবিতাই একমাত্র আধুনিক কবিতা। বলার কথা এই যে, এইভাবে সময়কে নির্দিষ্ট করে কবিতার আধুনিকতা বিচার করাটাই অযৌক্তিক। আসলে আধুনিক কবিতা বললে আমরা সাধারণ ভাবে যে ছবিটি আমাদের মানসে, আমাদের চিন্তায় খুঁজে পাই তা হল, সেই পুরোনো সংস্কারগুলো ভেঙে পড়ছে, পুরোনো পৃথিবীর মূল্যবোধগুলো একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে এবং তার বিপরীত দিকে নতুন সংস্কার, নতুন মূল্যবোধ, নতুন ভাষারীতি, সম্পর্কের নতুন রসায়ন ও নতুন চিত্রকল্পকে নিয়ে সামগ্রিক ভাবে কবিতার যে নতুন জগত তাকেই আমরা আধুনিক কবিতা হিসাবে চিনি ও জানি।

এ তো গেল ভাবনার কথা, কিন্তু যদি প্রশ্ন হয় আধুনিক কবিতা বা আধুনিকতার সংজ্ঞা কী বা আধুনিক কবিতা বলতে আমরা কী বুঝব? এটার উত্তর খুঁজতে আমাদের পাথেয় সেই রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধে এ বিষয়ে জানিয়েছেন—

"মডার্‌ন্‌ বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্‌নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা। নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌। বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।"

—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন ক্যালেন্ডারের পাতা মেলানো যে সময়, সেই সরলরৈখিক সময়ে আধুনিকতা আবদ্ধ নয়। কারণ আধুনিকতার কিছু চরিত্র রয়েছে, আধুনিকতার কিছু নির্ণয় রয়েছে। এই নির্ণয় আবার কিছু প্রাসঙ্গিকতার উপর দাঁড়িয়ে, সেখানে কিছু সামাজিক-রাষ্ট্রিক নতুনত্বের জলছাপ রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল এটা কী করে উপলব্ধ, এটা দেখতে গিয়ে আমরা দেখব যে আমাদের সামাজিক ইতিহাসে মহাসমরের রূপে দু'টি বড় ঘটনা ঘটে যায়। এই দু'টি মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত আমরা মানুষের মৃগয়ায় মানুষকে এমন অসহায় ভাবে শিকারে পরিণত হতে দেখিনি, আমাদের ধারণায় এটা ছিলই না যে মানুষ এত নিষ্ঠুরভাবে স্বজাতি সংহারক রূপ নিতে পারে। কারণ আমরা রামায়ণ-মহাভারতের কাল কেবল গল্প হিসাবেই গ্রহণ করেছি তাকে চাক্ষুষ দেখিনি, তাই ততবড় বিপর্যয়ও আমাদের দেখা হয়নি। কিন্তু এবার মানুষ যা দেখল তা এই দু'টি মহাযুদ্ধের ফলে, তাতে এতদিনের মূল্যবোধগুলো মানুষ সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে, ভগবান সম্পর্কে, প্রেম সম্পর্কে, পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে, কল্যাণমুখী ধারণা সম্পর্কে আমাদের চিন্তাভাবনাগুলো বদলে গেল, এমনকি সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চিন্তাভাবনা গড়ে উঠতে শুরু করে। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় প্রেমের কথা বলেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ একসময় সত্যম-

শিবম-সুন্দরের কথা বলেছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ', রাবীন্দ্রিক এসকল চিন্তাভাবনার বিপরীতে মহাযুদ্ধের উত্তরকালে একটি বিশেষ চিন্তাভাবনার জগত গড়ে উঠল। চিন্তাবিদ আবু সৈয়দ আইয়ুবের একটি মন্তব্য এ স্থলে বিশেষ স্মর্তব্য—

"কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী, এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গ্রহণ করেছি।" (ভূমিকাংশ, আধুনিক বাংলা কবিতা) আধুনিক কবিতা নিয়ে আবু সৈয়দ আইয়ুব কথিত এই মন্তব্যটির দু'টি দিক রয়েছে। তার একটি হল সময়ের দিক থেকে মহাযুদ্ধ পরবর্তী, অর্থাৎ মানব সভ্যতার সন্মুখে যে ভয়ঙ্কর প্রবল দুটি মহাযুদ্ধ ঘটে গিয়েছে তার পরবর্তী সময়ের কবিতা। বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের কবি টি.এস এলিয়ট 'The wasteland' (১৯২২) এবং 'The Hallowman' (১৯২৬) লিখছেন, যেখানে তিনি এতদিনের চেনাজানা মানুষের বাইরে এক অন্য ধরনের মানুষের অস্তিত্বকেই রূপ দিলেন। কীরকম এই অস্তিত্ব, দেখা যায় এখানের মানুষগুলো কেমন যেন কাঠখোট্টা মানুষ, ফাঁপা মানুষ আর পৃথিবী হয়ে যাচ্ছে wasteland বা পতিত জমি। তাই এই পৃথিবীর পতিত জমিতে পুরোনো ধ্যান-ধারনা, পুরোনো ঐতিহ্য, পুরোনো রীতি-নীতির আবাদ আর হয় না, তার বদলে আসছে নতুন এক চিন্তা, নতুন সব মানবিক সম্পর্কের রসায়ন। তাই বিশ্বসাহিত্যের এই বদলে যাওয়া সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেই এই সকল প্রতিভাবান কবি যথা এলিয়েট, পাউন্ড, ইয়েটস, বোদলেয়ারের সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলা কবিতা ও কবিদের ওপরে। সেই সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, আইনস্টাইন, ডারউইন, মার্ক্সের তত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছু মিলে মিশে বাংলা আধুনিক কবিতার একটি অন্য জগত নির্মিত হয় যা এত দিনের পুরোনো কবিতা অবয়বের সঙ্গে একেবারেই বেমানান ও ব্যতিক্রম। এর ফলে বাংলা কবিতায় মানুষের বোধে আসছে বিপন্নতা যেমন জীবনানন্দ দাশের কবিতা। আবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার মতো মানুষ এবার সাহস পাচ্ছে দুঃখভোগী হয়ে উঠার। উদ্দাম যৌনতার কথা, ভোগের কথা বলতে এবার আর বাংলা আধুনিক কবিতা কুণ্ঠাবোধ করে না, যেমন- মোহিতলাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা। সর্বোপরি আধুনিক বাংলা কবিতা এক অন্য মঙ্গলবোধে দীক্ষিত হয়ে উঠল, যে মঙ্গল সাধনের হাতিয়ার বিপ্লববোধ কিংবা বিদ্রোহ। বাংলা কবিতার সুখবিলাসী মানুষ এবার প্রথম মানবিক নির্মমতার বিরুদ্ধে যেমন আঙুল তুলল তেমনি নিজেকে না বুঝতে কিংবা বোঝাতে পাড়ার অসহনীয় বেদনায় নিঃসঙ্গতার আত্মকথন রচনা করতে সক্ষম হল।

এভাবেই পুরোনো গতানুগতিক কাঠামোর বাইরে যে কবিতা চর্চা বাংলায় শুরু হল যার প্রথম কাব্য পুরুষের দায়িত্ব অর্পিত হল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনানন্দ দাশ প্রমূখদের হাতে তাঁরাই বাংলা কবিতাকে অদেখা সুন্দরের জগৎ থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে যাপিত জীবনের সত্যকে আশ্রয় করে এক ব্যতিক্রমী কাব্য সৌন্দর্য নির্মাণে মনোনিবেশ করেছিলেন। এত সব সত্ত্বেও যদি এক কথায় বা এক বাক্যে আধুনিক কবিতার সংজ্ঞাকে

জানতে হয় তবে সত্যই তা দুরূহ কাজ। কারণ আধুনিক কবিতার ক্ষেত্র এতটাই বৃহৎ তাকে নিয়ে দু'য়েক কথার কাহিনি সাজিয়ে তার সামগ্রিক স্বরূপকে জানা সত্যই কষ্টকর। যেমন একদা সেইন্ট অগাস্টান কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলে ছিলেন— "If not aksed, I know, if you ask me, I know not" অর্থাৎ যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করলে অনেক কিছুই বলা যা কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কিছুই বলা সম্ভব হয় না। তবুও বলতে হয় কবিতার আধুনিকতা একটি আন্দোলন যা মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমী দুনিয়ার সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক প্রবণতা ও পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করে। আধুনিক কবিতার উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানান বিষয়কে যথাবিহিত শব্দবিন্যাসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপন করা। যেখানে কবির সৃজনশীল রচনা সময়ের দাবিতে, সমকালের আহ্বানে, মানব চেতনায় ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এটি প্রতিটি মানুষের আত্মসচেতনাকে প্রাধান্য দেয়, যদিও মূলত এটি একটি চিন্তাকাঠামো। মানব সভ্যতা মানুষের জীবনযাপন, ধর্মবিশ্বাস, নানা বিষয়ের ওপর যখন কোন কবির উপলব্ধি আধুনিক মননে ও আদলে হয় তখন সমাজ পরিবর্তনের মানসে পাঠককে আন্দোলিত করে এবং নিজেই অনুপ্রাণিত হয়। তখন তা আধুনিক কবিতায় রূপলাভ করে।

২.৪.১ : কবিতার মূল পাঠ

আট বছর আগের একদিন

জীবনানন্দ দাশ

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;
কাল রাতে— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ;

বধূ শুয়েছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায়- তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল— লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি

আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনওদিন জাগিবে না আর।

'কোনওদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম— অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে— অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরও দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন— যেন কোন্ বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
মরণের সাথে লড়িয়াছে;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের— মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা

এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ– সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের–
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে— গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প; কোনও
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনও খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু— আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনওদিন কেঁপে ওঠে নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ- নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরও-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয়: 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক্ দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো— বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

২.৪.২ কবিতাটির বিষয়বস্তু : কবি জীবনানন্দ দাশ রচিত 'আট-বছর আগের একদিন' কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। একজন স্বচ্ছল মানুষের নাটকীয়ভাবে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করার কাহিনিকে কবি কবিতায় একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। কবিতাটির মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় একজন সচ্ছল নামগোত্রহীন ব্যক্তি অকস্মাৎ জীবনের সবথেকে মর্মান্তিক চরম সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের তথাকথিত সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। কবি কথক হিসাবে

জীবনের এই চরম দুঃসংবাদ জানানোর দায়িত্ব নেন। পুরোপুরি গল্প বলার আদলে তুলে ধরেন এই আত্মহত্যার পূর্বপর ইতিহাস ও খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন এই আত্মহত্যার সম্ভাব্য কারণ। কবিতায় বর্ণিত কাহিনি অনুসরণে আমরা দেখতে পারি যে এক নাম পরিচয়হীন ব্যক্তি জীবনের সকল কাঙ্খিত সুখ ফেলে রেখে 'একগাছা দড়ি' হাতে বেড়িয়ে পরে জীবন বিসর্জন করতে।

জীবনের যেসকল বাহ্য সুখ তার যে একটিরও খামতি ছিল না এই উল্লেখিত ব্যক্তির জীবনে তার বহু প্রমাণ কবি তুলে ধরতে কুণ্ঠা করেননি। কিন্তু এই গার্হস্থ্য সুখই হয়তো জীবনের শেষ কথা নয়, অন্তত কবিতায় বর্ণিত এরূপ চরম অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে তো অবশ্যই। তাই কবি লিখেছেন—

"অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরও এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত-ক্লান্ত করে;"

মৃত্যুতে সেই চাহিদা নিবৃত্তির কিংবা ব্যস্ততম জীবন যাপনের ক্লান্তি নেই। এই কবিই তাঁর আরেক কবিতা 'সিন্দুসারস' কবিতাটিতে বলেছিলেন 'ক্লান্ত আমরা বেদনার সন্তান।' এই বেদনাবোধ যে কতটা তীব্র তারই মর্মান্তিক পরিণতি হয়তো লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা। আর এই বেদনাবোধের কারণ অবশ্যই সকলের মাঝে থেকেও নিজেকে নিঃসঙ্গ করে তোলা, একা পৃথক একটি জড় সত্তায় পর্যবসিত করা। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এই একাকী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। নির্জনতার একাকীত্ব সহজ উপলব্ধ কিন্তু জনারণ্যে, জাগতিক আয়োজনের সম্ভারের একা হয়ে যাওয়া অত্যন্ত মর্মান্তিক। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীরপত্র'-এর মৃণাল কিংবা 'হালদারগোষ্ঠী'-এর বনোয়ারীলাল এভাবেই একা হয়ে গিয়েছিল, এভাবেই একাকীত্বে ভুগেছিল শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'ঘুণপোকা' উপন্যাসের শম্ভু কিংবা রমাপদ চৌধুরীর 'হৃদয়' উপন্যাসের অরুণ। চূড়ান্ত যান্ত্রিক এই জীবনযাপনের অন্তিম আশ্রয় এক অকল্পনীয় সমীকরণ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার এই যুবকের শেষ সিদ্ধান্ত এলিয়েটের সেই ভয়ানক উচ্চারণের সহোদর।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে আত্মহননকে কবি যদি অন্যায় বলে মনে করতেন তবে হয়তো এ কবিতার জন্মইহত না। আসলে আমাদের প্রথাবদ্ধ অলস ধারণার গোড়াতে আঘাত করার জন্যই হয়তো কবির এই কবিতা নির্মাণ। তাই এই কবিতার কেন্দ্রে সেই নামগোত্রহীন মানুষটি, আর

প্যাঁচা-আদি সব প্রাণীর ভূমিকাই মূলত এক— এরা সবাই মিলে যেন একটি রেফারেন্স ফ্রেম— আর মানুষটি সেই ফ্রেমটিকে অতিক্রম করে চলে গেছে এক অপরাজিত উচ্চতায়। আসলে কবিতায় এই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত জীবনকেই যেন অপরিসীম উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তাই কবিতাটি কিন্তু সেই মর্মান্তিক পরিণতিতেই আটকে থাকেনি। যা সত্য তাকে স্বীকার করেই তাকে বদলে ফেলার এক নিভৃত বার্তা কবিতাটির পরবর্তী সম্পূর্ণ অংশ জুড়েই দেখা মেলে। আসলে মৃত্যুকে চূড়ান্ত নির্ণয় হিসাবে বেছে নেবার আগে কবি প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতার মধ্যেও নিজেকে টিকিয়ে রাখার বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি ফিরিয়েছেন।

এই কবিতার মাধ্যমে জীবনানন্দ দাশ ইঙ্গিতে কিছু বলতে চেয়েছেন এক অভিনব আঙ্গিকে। এখানে যুক্তি দেখানো হয়েছে; আত্মহত্যার কারণও দেখানো হয়েছে তবে সে কারণ খুব স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়নি। তাই কোনো ব্যাখ্যাকারী স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী এর গূঢ়ার্থকে উন্মোচন করার প্রয়াস পাবেন। মৃত্যুকে দলিত করে জীবনের গম্ভীর জয় কবি প্রচার করেছেন আট বছর আগের একদিন কবিতায়। নামগোত্রহীন এক পুরুষ ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে— আর এই খবরটি শুনে কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তার চারদিকে চাঁদ ডুবে যাওয়া অন্ধকারে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততাকে।

মানুষ বাঁচে কেন? মানুষ কেন মারা যায় তার অতি সাধারণ কারণগুলো সকলেরই জানা। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষ বাঁচবে কীসের জন্য? আর এই সূত্রেই প্রশ্ন উঠে আসে মানুষের জীবনের কি তেমন কোনও উদ্দেশ্য, অভিমুখ আছে? মানুষ কীসে সুখী হয়? মানুষের পাওয়া কি কখনও পূর্ণ হবে? এই এত এত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন স্বয়ং কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর আলোচ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির মধ্য দিয়ে। আসলে আলোচ্য কবিতায় এক 'চন্দ্রাহত' যুবকের কাহিনিকে আশ্চর্য দক্ষতায় উপস্থাপন করেছেন কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর এইসব জটিল প্রশ্নের উত্তর পেতে। কবিতার শুরু ভাববাচ্যে একটি মর্মান্তিক বার্তা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে—

"শোনা গেল লাশ কাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে;"

-অবাক পাঠক বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনার পূর্বেই প্রকট হয়ে পড়ে এই শোচনীয় বার্তার পিছনে কথক কবি আরও কিছু তথ্য জানেন, এই নামহীন ব্যক্তিটির জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে—

"কাল রাত— ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হল তার সাধ।"

-পাঠক মাত্ররই এবার চমকে ওঠার পালা কারণ এই মৃত্যু তবে 'সাধ'— কোনও স্বাভাবিক মৃত্যু বা দুর্ঘটনা জনিত আকস্মিক মৃত্যু বা হত্যা নয়, এ কেবলমাত্র আত্মহত্যা। তাই শুরু হয় অনুসন্ধান, খোঁজ চলে এই মৃত্যুর গূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটনের। তাই চেষ্টা করা হয় মৃত ব্যক্তিটির পারিপার্শ্বিকতাকে বুঝে নেবার। দেখা গেল পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাওয়া তার জীবনের ভিন্ন অর্থ বয়ে নিয়ে আসে। অথচ লক্ষণীয় এই মানুষটির জীবন কোনও রূপ অভাববোধে দীর্ণ ছিল না, তার ছিল না প্রণয়ের অস্থিরতা, কিংবা সন্তানহীনতার দুঃখ। কবি জানান—

"কোনও নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনও খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধু
মধু— আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে;"
আবার কবির অনুসন্ধানে এও উঠে আসে যে—
"হাড় হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনওদিন কেঁপে ওঠে নাই;"

-অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জীবনের প্রয়োজনীয় কোন কিছুই এই নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির জীবনে 'কোথাও রাখেনি কোনও খাদ', মূলত সাধারণ পার্থিব চাওয়া পাওয়ার দিক থেকে এই ব্যক্তির বিন্দুমাত্র অপূর্ণতা ছিল না। সুতরাং আটপৌরে জীবনের পরিভাষায় এই ব্যক্তিটি সুখী'ই ছিল। কিন্তু সুখের এইসব জাগতিক উপাচার তাকে কিন্তু তৃপ্তির ঘুম দিতে পারেনি, তাই কবি জানিয়েছেন— 'অথচ হয়নি ঘুম বহুকাল।' ঠিক এই বার্তা থেকে শুরু হয়ে যায় কবিতাটির জটিল দার্শনিক বুনন। মানুষের বাঁচার কারণ কী অথবা প্রশ্নটা এও হতে পারে মানুষ কেন স্বেচ্ছায় মরে? তবে কি তার অপূর্ণ কামনা, কিন্তু এমন কি কিছু আছে এই পার্থিব পৃথিবীতে যা পেলে মানুষ বলবে তার আর পাওয়ার কিছু নেই? ফলত পরিণতির বিচার কী, তা কি স্বেচ্ছামৃত্যুতেই সমাহিত।

একসময় অস্তিবাদীরা ভেবেছিলেন— "Subjectivity is truth, Subjectivity is realiity"— কিছু কিছু অনুভূতিশীল মানুষ জীবনে একসময় উপলব্ধি করে যে জীবনে অর্থাভাবের চেয়েও, গার্হস্থ্য

দুঃখের চেয়েও আরও জটিল কোন অভাব সে কখনও বহন করে। হয়ত সে তার একান্ত কারুবাসনা— যা সংসারের তথাকথিত সুখের আস্তরণ থেকে সে তাকে ফুঁসলে নিয়ে যায় অনেক দূরে। নিজেই নিজের অস্তিত্বের সংকটের কারণ হয়ে ওঠে অত্যন্ত সংগোপনে নিজের জীবনের বাঁধাধরা ছকটিকে অস্বীকার করে। পৃথিবীতে এর তো নিদর্শন কম নেই। এসব সত্ত্বেও বলতে হয় এই মৃত্যুগুলোর কারণ খোঁজা বা বোঝা বা এই অভাববোধ সকলের জন্য নয়। আলোচ্য কবিতার সেই নামগোত্রহীন যুবকের মৃত্যু তাই স্তম্ভিত করে সকলকে। আসলে আত্মহত্যার যতগুলো লোকমান্য থিওরি তার একটিও নেই আলোচ্য কবিতাটিতে; অথচ আত্মহত্যা আছে।

আলোচ্য কবিতাটির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখলে দেখতে পারব যে কবিতাটির শুরু হয়েছে একটি অপ্রস্তুত মৃত্যু চিন্তার মধ্য দিয়ে আর শেষ হয়েছে এক আশাবাদী জীবনচেতনার মধ্য দিয়ে। কবিতায় প্রধান চরিত্র যে লোকটি আত্মহত্যা করেছেন, তিনি কেন তা করেছেন, সেটাকে কবি দুইভাবে তুলে ধরেছেন।

১. জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়া

২. জীবনের দিকে আহ্বান

-মূলত যে আত্মহত্যা করে, তার কোনও যুক্তি বা দর্শন থাকে কিনা জীবনানন্দ দাশ তা দেখিয়েছেন। আত্মহত্যা করার আগে জীবনের প্রতি তার আর কোনও আকর্ষণ থাকে না, আশা থাকে না। নিঃসঙ্গতা ব্যক্তিমানুষের চূড়ান্ত ক্ষতি করে বসে, তাই আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কবির বিখ্যাত সেই উপমা- 'উটের গ্রীবার মতো কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে' নিঃসঙ্গতার বিবর্ণ রূপ তুলে ধরেছে সেই ব্যক্তির। জীবনে প্রেম, নারী, শিশু, গৃহ এত আশ্রয় থাকার পরেও 'বিপন্ন বিস্ময়' যাকে গভীর কোনও জীবনসত্য বলে কবি উল্লেখ করেছেন, সেই বাস্তবতাকে পাশ কাটাতে পারেনি আত্মহত্যাকারী ঐ ব্যক্তি। তাই সে পেরেছে 'এক গাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থ গাছ'-এ গেছে ঝুলে পড়তে। জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে এবং 'চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে' লাইনটি তার চূড়ান্ত পরিণতি বরণ করাকে বোঝায়।

অন্যদিকে আবার সেই উপেক্ষিত জীবনের দিকে আহ্বানও করেছেন কবি। যখন কেউ নিজেই নিজেকে শেষ করার একক সিদ্ধান্ত নেয়, জীবন কি তাকে ডাকে না বেঁচে থাকার জন্য? সেই আহ্বান মানুষ না করলেও প্রকৃতি এবং প্রাণী বা কীটপতঙ্গরা করে তাদের জীবনের অবিরাম ছুটে চলার মাধ্যমে। সেজন্য কবি জীবনানন্দ দাশ পেঁচা, ইঁদুর, মাছি, মশা, ফড়িং, দোয়েল এসব প্রাণী, পাখি বা পতঙ্গের কথা বলেছেন, যারা অস্তিত্ব রক্ষা করতে কোনও না কোনওভাবে বেঁচে আছে নিজেদের প্রয়োজনে। পেঁচা ইঁদুর শিকার করতে যায় নিজের প্রয়োজনে। তাই কবিতা কথকের পক্ষান্তরে কবির উপলব্ধি প্রাকৃতিক এই সকল উপকরণ দেখেও কি আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিটি বেঁচে থাকার কোনও

অনুপ্রেরণা পায়নি, সেটাই প্রশ্ন। অশ্বত্থের শাখা, জোনাকি, সুপক্ক যব তারাও এসে জানতে চেয়েছে, দেখাতে চেয়েছে তাদের জীবনমুখী আয়োজন। মৃত্যু বেছে নেয়া ব্যক্তিকে তাই কথক কবির প্রশ্ন- 'মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো?' জীবনের 'ভাঁড়ার' বা আবর্জনাকে মাড়িয়ে সবার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ত হয় না, তাই কেউ কেউ হয়ে ওঠে আত্মহন্তারক।

আলোচ্য কবিতাটিতে নাটকীয়তা তো আছেই, সেই সঙ্গে গল্পও আছে। মতবাদের কথা বললে 'এক্সপ্রেশনিজম'-এর কথা বলে যায়। ফ্রয়েড আসতে পারে মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য, যেখানে সংসার, হাড়হাভাতের গ্লানি, নারী বিষয়গুলোকে বিশ্লেষণ করা যায়। কবিতাটি জীবনমুখী অবশ্যই। যে জীবন নিজে শেষ করে দিচ্ছে, সেটাও যেমন বাস্তব কাউকে জীবনের দিকে আহ্বান করাটাও বাস্তব। তাই কবিতাটি বাস্তববাদীও বিপরীত দিকে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৫.১ কবিতার মূল পাঠ

মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়

জয় গোস্বামী

বেণীমাধব, বেণীমাধব, তোমার বাড়ি যাবো
বেণীমাধব, তুমি কি আর আমার কথা ভাবো ?
বেণীমাধব, মোহনবাঁশি তমাল তরুমূলে
বাজিয়েছিলে, আমি তখন মালতী ইস্কুলে
ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি

বেণীমাধব, বেণীমাধব, লেখাপড়ায় ভালো
শহর থেকে বেড়াতে এলে, আমার রঙ কালো
তোমায় দেখে এক দৌড়ে পালিয়ে গেছি ঘরে
বেণীমাধব, আমার বাবা দোকানে কাজ করে
কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি

আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন ষোল
ব্রীজের ধারে, বেণীমাধব, লুকিয়ে দেখা হলো

বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সে সব কথা এখনো মনে পড়ে?
সে সব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে?
আমি কেবল একটি দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে; অপূর্ব সে আলো!
স্বীকার করি, দুজনকেই মানিয়েছিল ভালো
জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।

রাতে এখন ঘুমাতে যাই একতলার ঘরে
মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে
আমার পরে যে বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে, কাল কী হবে? – কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমণি
তবু আগুন, বেণীমাধব, আগুন জ্বলে কই?
কেমন হবে, আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?

২.৫.২ কবিতার বিষয়বস্তু :

আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম সুযোগ্য উত্তরাধিকার জয় গোস্বামী বাংলা আধুনিক কাব্য সাহিত্যে বেশ কিছু অনবদ্য কবিতা রচনায় নিজের নাম প্রসিদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' এমনই একটি সার্থক নির্মাণ। কবিতার উপস্থাপন ও কাহিনি নির্মাণে হয়ত কোন তাত্ত্বিক জটিলতা নেই, বরং কবিতাটি অনেক সহজ সরল ভাব ভঙ্গিমায় এক কিশোর প্রেমের বিশেষ অনুভূতিকে বর্ণনায় তুলে ধরেছেন। মূলত 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতায় এক নারীর কৈশোর প্রেমের স্মৃতি ও প্রিয় মিলনের আকুতি ব্যক্ত হয়েছে। এখানে সেই কিশোরী নারীই কথকের ভূমিকায় তার কিশোর প্রেমের ব্যর্থতার আখ্যান শুনিয়েছে। আজকের সামাজিক পরিচয়ে সেলাই দিদিমণি, গতদিনের সেই কিশোরী মেয়েটি তার পূর্ব প্রেম ও তার প্রতি করা তার প্রেমিকের চূড়ান্ত অবহেলার

চিত্ররূপটি তুলে ধরেছে। আর সেই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে দরিদ্র পরিবারের স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার মর্মান্তিক ছায়াছবিটিও।

আলোচ্য কবিতার কাহিনি পাঠে আমরা দেখি যে, মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের সেই কিশোরী তার কৈশোরকালীন ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণায় যেমন নিমগ্ন হয়েছে তেমনি সেই কাহিনি অন্তরালে পীযূষ ধারার গতিতে বইয়ে দিয়েছে ন্যায় অন্যায়ের অভিব্যক্তি ও একটি মৌন প্রতিবাদ। পৃথিবীতে সব প্রেম সফলতার মুখ দেখে না সামগ্রিক প্রাপ্তির অতিমাত্রিক ছোঁয়ায়, অথচ সেই প্রেমের অন্তরালে কীভাবে হারিয়ে যায় একটি সম্পূর্ণ কাল তারই অনবদ্য আখ্যান আলোচ্য 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটি। সেইসঙ্গে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো যে ক্ষতের জন্ম দেয় তাকে সারাজীবন বয়ে বেড়ানোর যে যন্ত্রণা তাও আলোচ্য কবিতার মধ্য দিয়ে সুপ্রকাশিত। কাহিনিতে দেখি মেয়েটি যখন নবম শ্রেণিতে পড়ে ঠিক তখন বান্ধবী সুলেখাদের বাড়ি বেণীমাধবের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। বেণীমাধবের ব্যক্তিগত যেটুকু পরিচয় ফুটে উঠে তাতে পাওয়া যায় সে শহরের ছেলে এবং পড়াশুনোতে ভাল। কিন্তু এখানেই মেয়েটির একটি পরিচয় উঠে আসে যে সে চেহারাগত দিক থেকে কালো। তার বাবা সামান্য একটি দোকানে কাজ করতেন যার ফলে তাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল ছিল না। কিন্তু ভালোবাসা কিংবা ভালো লাগা এহেন প্রতিবন্ধকতার তোয়াক্কা করে না; ফলত বেণীমাধবকে দেখার পর থেকে মেয়েটির মন এক অদ্ভুত শিহরণকারী দেশে পাড়ি জমাল। এই যাত্রায় সে এতটাই গভীরভাবে অনুরক্ত ছিল যে তার পড়াশোনাতে এবার ব্যাঘাত ঘটতে শুরু হল, কবির কথায়—

"কুঞ্জে অলি গুঞ্জে তবু, ফুটেছে মঞ্জরী
সন্ধেবেলা পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করি"

-ফলত এবার সময় প্রেমের প্রথম ধাপ পেরোনোর, অর্থাৎ প্রয়োজন সাক্ষাৎ দর্শনের। সেটাও ঘটল ব্রীজের ধারে তাদের লুকিয়ে দেখা করার মধ্য দিয়ে। এরপরের কাহিনি প্রেমের এই প্রজাপতি রঙ থেকে ধাবিত হয় বেদনার বর্ণহীন জগতে। যেখানে ঘোষিত হয় একদা মেয়েটির মনে প্রেমের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করা বেণীমাধব নামক ছেলেটির বর্তমান প্রেমিকার প্রসঙ্গ। আর বিপরীতে সেই মেয়ে আজ সেলাই দিদিমণি হয়ে একা ও নিঃসঙ্গ। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়ের স্মৃতি চর্চাই তার এখন একমাত্র সম্বল। তাই কবিতাটির পরিণতি পূর্বরাগ থেকে বিরহ পর্যন্ত।

কবিতাটিতে মেয়েটির কোন নাম নেই। ফলত এই নামহীন মেয়ের মধ্য দিয়ে কবি বঙ্গদেশের হাজার কালো দরিদ্র মেয়েদের ব্যর্থ প্রেমের আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে ব্যর্থ স্বপ্নের কান্না শুনিয়েছেন। যতদিন তার বুকে প্রেমের বেণু বাজেনি ততদিন মেয়েটির মন পড়াশুনাতেই ছিল, তখন সে 'ডেক্সে বসে অঙ্ক' কষত। কিন্তু মনে সেসময় নিজের একটি মানুষের সুপ্ত আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলেছিল দিদিমণির পাশের দিদিমণির বর। বরের এই বিশেষ রোমাঞ্চ, বেণীমাধবের প্রেমাবেশে যেন পূর্ণতা পায়ে।

কিন্তু আঘাত আসে এরপরই যার ফলে তার সন্ধ্যাবেলাতে পড়তে বসে অঙ্কে ভুল করাটা হয়ত তার জীবনের অঙ্কের গরমিলের দিকটিকেই নির্দেশ করে।

প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন বেণীমাধবকে ভুলতে চেয়েও সে ভুলতে পারেনি বরং চিকিৎসাহীন ক্ষতের মতো কেবলই ছড়িয়ে পড়েছে সংক্রমণ। আসলে তার জীবনের প্রথম প্রেম তা যেন নিরাময়হীন রোগের মতো, কিছুতেই সারতে চায় না। তাই তার উপলব্ধি—

"বেণীমাধব, বেণীমাধব, এতদিনের পরে
সত্যি বলো, সে সব কথা এখনো মনে পড়ে?
সে সব কথা বলেছো তুমি তোমার প্রেমিকাকে?"

শেষ পংক্তি থেকে এ কথা স্পষ্ট যে এই প্রেম কখনই এক পাক্ষিক ছিল না, যার ফলে বেণীমাধবের পাশে তার প্রেমিকার সামঞ্জস্য স্বীকার করেও আজকের সেলাই দিদিমণি স্বীকার করে যে এটা তার কাছে কতটা অসহ্য। তার ভাবনায় পাই—

"জুড়িয়ে দিলো চোখ আমার, পুড়িয়ে দিলো চোখ
বাড়িতে এসে বলেছিলাম, ওদের ভালো হোক।"

একটু সচেতনভাবে লক্ষ করলে দেখব যে উক্ত পংক্তি দুটির অভিব্যক্তি একেবারেই পরস্পর বিরোধী। কারণ এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, যে সম্পর্কে নিজের সম্পর্কের মৃত্যু চিহ্ন রয়েছে, সেই সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি চোখ পুড়িয়ে দেওয়াই সংগত; কিন্তু তাহলে এখানে চোখ জুড়িয়ে দেওয়ার অভিব্যক্তি কেন, 'ওদের ভালো হোক' আকাঙ্খার মধ্য দিয়ে কেন এই মঙ্গলাশীষ কামনা? আসলে কবি প্রকাশিত এই তিন বিশেষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেয়েটির প্রেমের না পাওয়ার বেদনা, তার প্রেমের সুখস্মৃতি রোমন্থন আর নিজের ভালোবাসার মানুষটিকে না ভুলতে পারার দরুন তার খারাপ না চাওয়া। আসলে কবি এখানে একটি অসম্পূর্ণ প্রেমের কথা তুলে ধরেছেন। সমাজ বঞ্চিত একটি মেয়ের দৃষ্টিকোনে সমাজের তথাকথিত ধারণা অনুযায়ী আলোচ্য মেয়েটির দু'টি সমস্যা, যা তার অযোগ্যতার মাপকাঠি। এক তার গায়ের রঙ কালো, দুই আর্থিক দিক থেকে সে দুর্বল। সুতরাং এই দু'টি সমাজ প্রচলিত অযোগ্যতার ধারণাই মেয়েটির পূর্ণতার পথের বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে এসে অতীতের রূঢ় বাস্তবতার মধ্যেও দেখা যায় মর্মক্লান্ত অতীতের প্রসঙ্গ। যেখানে উঠে আসে বেণীমাধবের প্রেমিকার প্রসঙ্গ, সে প্রশ্ন করে বেণীমাধব কি তার প্রেমিকাকে এই অপ্রস্তুত প্রেমের কথা জানিয়েছে। এখানে প্রথম স্তবকে মেয়েটির বলা সুলেখা শীর্ষক মেয়েটির কথা মনে পড়ে, মূলত যার বাড়িতেই প্রথম বেণীমাধবের সাথে তার পরিচয় হয়। প্রশ্ন হল কে এই সুলেখা, সে বর্তমানে বেণীমাধবের প্রেমিকা নয় তো? কারণ সুলেখার নামেই রয়েছে সৌন্দর্যের আভাস আর সে কালো, আর বাড়ির প্রসঙ্গে হয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে তার আর্থিক অবস্থার দিকটিকেও। ফলত সমাজ প্রচলিত যে দুটি ধারণা কবিতার নায়িকার প্রেমের বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল,

সুলেখার ক্ষেত্রে তার একটিও রইল না। আর এজন্যই কবিতাটির তৃতীয় স্তবকে বর্তমানের পাশে এসে অতীত থমকে দাঁড়ায় এইভাবে—

"আমি কেবল একটা দিন তোমার পাশে তাকে
দেখেছিলাম আলোর নীচে; অপূর্ব সে আলো।
স্বীকার করি, দুজকেই মানিয়েছিল ভালো"

—অতীতের দেখা ঘটনাকে বর্তমানে স্বীকৃতি জানানোর মাঝে হয়ত মেয়েটির সমাজ প্রদত্ত খামতিকে মেনে নেওয়ার মানসিকতাকেই স্পষ্ট করে।

এতক্ষণ যাবৎ কবিতাটিতে মেয়েটির জীবনে অতীতের যে আবহ ছিল চতুর্থ স্তবকে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা মিলিয়ে যায়। বরং শেষ স্তবকে পাড়ার সেলাই দিদিমণির নিঃসঙ্গতা ও বেদনা মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। সংঘাতময় জীবনের আজকের সব থেকে বড় প্রশ্ন, মাথার উপর চাল আর নিজের ও পরিবারের ক্ষুধা নিবৃত্তি, তার কথায়—

"মেঝের উপর বিছানা পাতা, জ্যোৎস্না এসে পড়ে
আমার পরে যে বোন ছিলো চোরাপথের বাঁকে
মিলিয়ে গেছে, জানি না আজ কার সঙ্গে থাকে
আজ জুটেছে, কাল কী হবে?"

—বিরহ-যন্ত্রণাময় এই কবিতার সব থেকে মর্মান্তিক পরিণতি হয়তো এটাই, যা 'আজ জুটেছে, কাল কী হবে?' পংক্তিটির দ্বারা অভিব্যক্ত। আর এই আশাহীন ভবিতব্যের জন্যই হয়তো বেঁচে থাকার তাগিদে সেলাই দিদিমণি ছোট বোন নষ্ট মেয়ের পরিচয় শরীরে এঁটে শহরের অন্ধকার গলিতে হারিয়ে গিয়েছে। যার জীবন সুন্দর হতে পারত, তার জীবনের হিসেবের এত এত ভুল দেখে এখন মেয়েটির মনে আগুন জ্বলে উঠে। ধ্বংস করার আতিশয্যে নিজের প্রেমিকের ক্ষতি করতে না পারা মেয়েটি কবিতার শেষ চরণে জানায়- 'কেমন হবে আমিও যদি নষ্ট মেয়ে হই?' একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রথম স্তবকের 'আমি'র চোখে ছিল প্রথম প্রেমের মায়া-কাজল, আর শেষ স্তবকের 'আমি'র চোধে আছে বিরহ-যন্ত্রণা। প্রথম স্তবকে ছিল স্বপ্ন, শেষ স্তবকে আছে কান্না। এভাবেই স্তবকে স্তবকে কিশোরী নারীর প্রেমের ব্যর্থতা ও পারিবারিক ধ্বংসচিত্র সমানুপাতে শৈলীগত ভাবে আলোচ্য কবিতায় তাৎপর্য লাভ করেছে।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

২.৬ পরাবাস্তববাদী কবিতা আন্দোলনের আলোকে 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা

সুররিয়ালিজম বা পরাবাস্তববাদ হল বিংশ শতাব্দীর একটি সাহিত্যিক, দার্শনিক এবং শৈল্পিক আন্দোলন যা মনের অভ্যন্তরে স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যে বিরোধ তার একটি সমন্বয়ের চেষ্টা। তাই এখানে এমন সব চিত্রকল্প নির্মাণ করা হয় বাস্তবের সঙ্গে যা মেলে না। যেমনটা স্বপ্নের জগতে হয়, যা যুক্তির পথ বেয়ে চলে না। কিন্তু এক সময় একেই বাস্তবের সঙ্গে অন্বিত করতে হয়। একেই বলা যায় পরাবাস্তববাদ। যেখানে রূপ-রস-গন্ধময় পার্থিব অনুভূতিকে ছাড়িয়ে অবচেতনজাত স্বপ্নময় চিত্রকল্প নির্মাণ। কবিতার ক্ষেত্রে এমন সব চিত্রকল্প ব্যবহার করা হয় বাস্তবের সঙ্গে যার কোনও যোগ থাকে না। ফরাসি তথা ইউরোপীয় শিল্প ও সাহিত্যে ১৯২০ ও ১৯৩০- এর দশকে বিশেষ ভাবে সাড়া ফেলেছিল এই পরাবাস্তববাদ। যার উদ্ভব নিহিত রয়েছে ডাডাবাদের গর্ভে। এই সময়ের অন্যতম ডাডাবাদী কবি আঁদ্রে ব্রেঁত প্রকাশ করেছিলেন 'Manifeste du Surrealism' অর্থাৎ পরাবাস্তববাদের ইস্তাহার। এর আগে গীয়ম আপোলোনিয়র তাঁর 'টাইরেসিয়াস-এর স্তন' নাটকে প্রথম 'সুরিয়ালিস্ট' শব্দটি ব্যবহার করেন; যার মাধ্যমে তিনি বাস্তবের সীমা অতিক্রমের প্রয়াসকে বোঝান। আসলে যুক্তির অনুশাসনের বাইরে যে এক মগ্নচৈতন্যের অধিবাস্তব জগৎ রয়েছে সেখানে অবগাহন করে তার অতল রহস্যকে যথাযথভাবে উদঘাটিত করাই ছিল সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য। মূলত ফ্রয়েড প্রদত্ত 'ইদ' বা মগ্নচৈতন্যকে শিল্প-সাহিত্যে প্রতিফলিত করার প্রয়াসে সুররিয়ালিজমের জন্ম।

আধুনিক বাংলা কাব্যান্দোলনে অনেক কবিই এই সুররিয়ালিজমকে পাথেয় করে তাদের কাব্যবাসর নির্মাণে ব্রতী হয়। এই পাথেরই সার্থক প্রাণপুরুষ হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ। বিভিন্ন সমালোচক তাঁর কবিতাকে প্রতীকী, অবচেতনবাদী, চিত্রকল্পপ্রধান বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে কবির নিজস্ব অভিমত হল— "আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজচেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার; কারও মীমাংসায় এ কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরও নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য— কোনও কোনও কবিতা বা কাব্যের কোনও কোনও অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।" খুবই সত্য কথা। জীবনানন্দকে সামগ্রিক ভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রধান প্রধান আধুনিক কাব্য আন্দোলনের দিকে যেতে হবে, কিন্তু সব মিলিয়ে সব কাব্য আন্দোলনকে স্বীকার ও অতিক্রম করে তাঁর কাব্য শেষ পর্যন্ত অন্যরূপ নেয়। এর মূলে রয়েছে সৃষ্টি প্রতিভার 'অ্যালকেমি' বা মন্ত্ররসায়ন, যা শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে মৌলিক করে তোলে।

বস্তুত জীবনানন্দ দাশের কবিতায় সুররিয়েলিস্ট ভঙ্গী বা অবচেতনার গুরুত্বের জন্য ফ্রয়েডীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কাব্য-কবিতার অনবদ্য ও উন্মোচনী । ফ্রয়েডের ইগো, সুপার ইগো, ইদ্— অহং, অধিশান্তা ও অবচেতনা-সম্পর্কিত উদ্ভাবন বিশ্ব কবিতা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। স্বপ্ন ও দিবাস্বপ্নের

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচ্য মনস্তাত্ত্বিক সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে 'The interpretations of Dreams'-গ্রন্থে ফ্রয়েড জানিয়েছেন স্বপ্ন হচ্ছে আসলে ইচ্ছাপূরণ, তাঁর কথায় "When the work of interpretation has been completed the dream can be interpreted as a wishfulfilment." আবার আমরা এও জানি যে ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বে যৌনতার একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যা প্রাণী সাধারণেরই সহজাত প্রবৃত্তি তাকে তারা ক্ষুধার সঙ্গে তুলনা করেছেন; আর এই কারণে বৈজ্ঞানিকেরা এই যৌনক্ষুধার নামকরণ করেছেন 'লিবিডো', তাই জীবনানন্দ দাশের কবিতাই সুররিয়ালিস্ট বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের জন্য এই সকল মনস্তাত্ত্বিক দিক মাথায় রেখেই আলোচনায় এগিয়ে যেতে হবে।

পাঠ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় অবচেতনা তার ভয়াবহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এ কবিতায় রয়েছে Morbidity বা অস্বভাবী মনস্তত্ত্ব, অবচেতনার সঙ্গে যার নাড়ীর যোগ এবং সাংকেতিকতার আদর্শ কবি পুরুষ বোদলেয়ার যে 'distortion' বা বিকৃতিকে সৌন্দর্যের প্রধান লক্ষণ বলেছেন সেই একই ঘরানার এক সমাহার আলোচ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি। আলোচ্য কবিতায় কবি প্রথমে লিখেছেন—

"বধূ শুয়েছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়— "

— জীবনে এর থেকে বড় কোনও সৌন্দর্যচেতনা তো হতে পারে না, যেখানে পুরুষের পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বধূ ও শিশু তার পাশে ছিল, কিন্তু এটাই জীবনের সামগ্রিক সত্য নয় তাই কবি আবার লিখলেন—

"...তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল— লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনওদিন জাগিবে না আর।"

এই ভূত দেখার শর্তেই সেই নামগোত্রহীন পুরুষের জীবনে এসে গেল যাপনের কিছু বিকৃত অনুষঙ্গ, যেখানে সত্য হয়ে দেখা দিল ভূত, মড়কের ইঁদুর, রক্ত, ফেনা ইত্যাদি। আসলে এই হচ্ছে সৌন্দর্যকে সুররিয়ালিস্ট কবিতায় আর্টে পরিণত করার প্রক্রিয়া— যেখানে সৌন্দর্যের পাশাপাশি বিকৃত অনুষঙ্গ একান্ত কাম্য। তাই কবিতাটিতে বধূ, শিশু, প্রেম, আশা, জ্যোৎস্না যেমন সৌন্দর্যের উপাদান ঠিক তেমনি ভূত, মড়ক, থেতানো ইঁদুর ইত্যাদি বিকৃতির উপাদান।

অন্যদিকে এ কবিতায় বর্ণনাকারী-র অবচেতনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে আত্মহত্যার অভিলাষ। তাকে আর অবদমিত করে রাখা যায়নি, 'repression' –এর মধ্যে বন্দী রাখা যায়নি। কবি—

"কোনওদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম
'সহিবে না আর
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেল — অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মত কোনও এক নিস্তব্ধতা এসে।"

'উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা' হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার অবচেতনার গর্ভ ছিন্নভিন্ন করে হঠাৎ জেগে ওঠার সংকেত। এ হচ্ছে আদিম আত্মহননের ইচ্ছা। জীবন যদি সৌন্দর্য হয়, এই আত্মহত্যার বাসনা বিকৃতিরূপে তার সঙ্গে চিরলগ্ন— মানুষই তার আত্মধ্বংসে সর্বাধিক সামিল এবং সুররিয়ালিস্ট কবিরা সৌন্দর্যের সঙ্গে এই বিকৃতির যোগেই কবিতার উদ্‌গতি লক্ষ্য করেছিলেন। জীবনানন্দও কোনও ব্যতিক্রম নন।

Automatic writing বা স্বতঃস্ফূর্ত লেখনী চালনাকে সুররিয়ালিস্ট কবিতার একটি প্রধান লক্ষণ বলা হয়েছে। এখানে ভাষা ও শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গ আসবে। একজন সুররিয়ালিস্ট কবি লেখার সময় তাঁর ভাবনাকে তাঁর অনুদিত শব্দ-প্রবাহে অবাধে বইতে দেন; সেখানে তিনি কোনও বাধা আরোপ করেন না। ফ্রয়েড যাকে বলেছেন 'Free Association' বা অবাধ ভাবানুষঙ্গপদ্ধতি, সেই পদ্ধতিরই কবিতায় প্রয়োগ। ফলত এ সময় শব্দ সম্পর্কে কবির শুচিবাচকতা লক্ষ করা যায় না, যেমনটা দেখা যায় না জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার বিভিন্ন পংক্তির শব্দ ব্যবহারে, যথা—

"জীবনের এই স্বাদ– সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের–
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে— গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।"

— জীবনের এহেন বিবর্ণ অভিজ্ঞতা এমন বীভৎস শব্দ বন্ধনে তুলে ধরা তো একজন সুররিয়ালিস্ট কবির পক্ষেই ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। সুখ সংসারের শান্তির কপাট খোলা রেখে আত্মহত্যার পথে পা

মেলানো মর্গের সেই মৃত শরীরের সঙ্গে থ্যাঁতা ইঁদুরের এমন মেলবন্ধন গড়ে তোলা আসলে অবচেতনাকে জানবার, তাকে চেতনার আলোকে পুনরুদ্ধার করে লতার সঙ্গে বোঝাপড়ায় পৌঁছোনোর একটি প্রক্রিয়া বলতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন ভাবনা ও ভাবনা প্রকাশক শব্দের উপর থেকে সব রকম নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া; জীবনানন্দ এখানে সেই কাজটিই করেছেন।

ক্ষণস্থায়ী জেনেও মানুষ তাঁর জীবনকে তুমুলভাবে বিশ্বাস করে, এর ফলে শেষ পর্যন্ত সেই বিশ্বাসকে সে হারিয়েও ফেলে। মানুষ হচ্ছে এক অমোঘ স্বপ্নদর্শী— এ কথাটি বলেছেন আঁদ্রে ব্রেঁতো তাঁর প্রথম সুররিয়ালিস্ট মেনিফেস্টের পাতায়, সে তার নিজের ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিদিন আরও বেশি করে অসন্তোষে ভুগছে। তাই শেষ পর্যন্ত মানুষ তার নিজস্ব শৈশবে অথবা জীবনের প্রারম্ভের কালগুলোতে ফিরে যেতে চায়। কারণ একদা সেখানে সে ছিল স্বাধীন ও সর্ব নিয়ন্ত্রণমুক্ত, নিজস্ব স্বপ্নের পূর্ণতর অধিশ্বর। আর তারই বিপরীতে প্রাপ্ত জীবনের ক্ষেত্র থেকে ক্রমাগত বিতাড়িত পলাতক মানুষ শেষ পর্যন্ত এক বিশেষ ধরনের ভীতি ও আক্রমণের শিকার হয়। সেই ভীতি ও আক্রমণেরই বহিঃপ্রকাশ রয়েছে আলোচ্য 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। যেখানে মানুষ তার নির্মল উৎসে ফিরে যেতে চাইছে সম্পূর্ণ আত্ম-আবিষ্কারের জন্য। অস্তিত্বের বিপন্ন বিস্ময়কে বুঝবার জন্যই তাকে খুঁজে নিতে হয়েছে লাশকাটা ঘরের নিয়তি, কবির কথায়—

"আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত— ক্লান্ত করে;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের' পরে।"

সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার এই লাশকাটা ঘর আসলে মুক্তি, স্বাধীনতা এবং অবাধ ভাবানুষঙ্গের পথে ভ্রমণকে সংকেতিত করেছে। মানুষ ধীরে ধীরে তার বাঁচার সমস্ত ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে কারণ প্রেম প্রীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সে আপন সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে না, একঘেয়েমির বা এক ক্লান্ত নিঃসঙ্গতার বলি হয় সে তখন। তার দেহ মন আত্মা নিয়ে সম্পূর্ণ সে শুধু এক বাস্তব প্রয়োজনের ক্রীতদাস হয়ে ওঠে। জীবনের এই সমস্ত দিক শেষ পর্যন্ত তাকে বিষাদগ্রস্ত ও বিদ্রোহী করে তোলে। আর তখন তার অভিব্যক্তি হয় কবিতায় বর্ণিত মানুষটির ন্যায়—

"জানি— তবু জানি
নারীর হৃদয়— প্রেম— শিশু— গৃহ- নয় সবখানি;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরও-এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;"

এই 'বিপন্ন বিস্ময়' বস্তুত মানুষের নিজের সৃষ্টিশীলতাকে ধ্বংসের হাত থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য এক সুতীব্র বাসনা অথবা সঙ্কল্প। এই 'বিপন্ন বিস্ময়' শৈল্পিক মাত্রা অর্জন করে মানুষের রচিত কবিতায়-গল্পে-চিত্রে-ভাস্কর্যে। আর আলোচ্য কবিতাতে এই 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর পালে ভর করে কবি নিঃসন্দেহে পৌঁছে গিয়েছেন সুররিয়ালিজমের অনর্বচনীয় জগতে।

২.৭ 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার নামকরণের সার্থকতা

সাহিত্যের পটভূমিতে নামকরণের একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে, ব্যক্তির ক্ষেত্রে নামকরণ আবেগের সামগ্রী হলেও সাহিত্যের পটভূমিকায় নামকরণ হল তার মূল বিষয়ের প্রেক্ষাপট নির্মাণের পূর্ব ইঙ্গিতস্বরূপ। ফলত সাহিত্য ক্ষেত্রে নামকরণ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন সাহিত্য স্রষ্ঠা তাই কিছু বিশেষ দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্যের নামকরণ নির্মাণ করে থাকেন। ফলত মহৎ সাহিত্য নির্মাণে নামকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বাংলার আধুনিক কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটির নামকরণ বিষয়ে আলোকপাত করব। বিচার করব কবিতাটির নামকরণ কতখানি সফলতার সঙ্গে নির্মিত।

আমরা সকলেই জানি যে, 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটি একটি অপূর্ণ প্রেমকে কেন্দ্র করে নির্মিত। তবে শেষ পর্যন্ত প্রেমের পাশাপাশি বর্তমান জীবন সংগ্রামকেও কবি আশ্চার্য কাব্যিক দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি জয় গোস্বামী আধুনিক যাপন সংকটের সঙ্গে আপন শৈল্পিক দক্ষতাকে একাত্ম করে এই কবিতাটি উপস্থাপন করেছেন। আলোচ্য কবিতা পাঠে দেখি কবি জয় গোস্বামী একটি বিদ্যালয়ের কিশোর প্রেম ও তার বেদনাময় পরিণতিকে দিয়ে আলোচ্য কবিতার প্লট নির্মাণ করেছেন। নামহীন এক বিদ্যায়তনিক বালিকা প্রায় এক পাক্ষিক প্রেমে আক্রান্ত হয়েছিল শহুরে ছেলে বেণীমাধবের সঙ্গে। কৃষ্ণকায় এই মেয়েটি তার মনের গহনে দাগ কাটা পুরুষটিকে প্রথম দেখেছিল তারই বান্ধবী সুলেখাদের বাড়ি। যদিও এই কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র মেয়েটির মনে প্রেমের দাগ কাটার কারণটিও অনন্য। সেটি হল সে তারই স্কুলের দিদিমণির পাশে তার বরকে দেখে, তারও বুকে বর সম্বন্ধীয় আকাঙ্খা জন্ম লাভ করে। তার কথায়—

"ডেস্কে বসে অঙ্ক করি, ছোট্ট ক্লাসঘর
বাইরে দিদিমণির পাশে দিদিমণির বর
আমি তখন নবম শ্রেণী, আমি তখন শাড়ি
আলাপ হলো, বেণীমাধব, সুলেখাদের বাড়ি"

-এই তো কাহিনির শুরু ছোটগল্পধর্মী এই কবিতায় 'মালতী বালা স্কুল' পড়া এক কিশোরী কন্যার মনে শহরের ছেলে বেণীমাধব কীভাবে প্রেমের মোহন বাঁশি বাজিয়েছিল তার চিত্ররূপ দিয়ে কবিতাটির শুরু।

নবম শ্রেণির ছাত্রী বলার সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি পরিধানের প্রসঙ্গটি হয়ত মেয়েটির কৈশোরে যৌবনের প্রাক্ স্পর্শের দিকটিকে উদ্ভাসিত করার জন্য উল্লেখ করেন। অথচ প্রেমের পূর্বরাগ কাটতে না কাটতে কবিতাটির এই নবীন প্রেম এক সাংঘাতিক পরিণতির পথে পা বাড়ায়। মালতীবালা বিদ্যালয়ের সে কিশোরী মেয়ের প্রেম কেবল ব্যর্থ হয়নি কাহিনির নায়িকার পরিণতিও ভয়ঙ্কর নিরপত্তাহীনতার দিকে অগ্রসর হয়।

নিজের সাংসারিক চাহিদা মেটাতে সে আজ তার পাড়ার সেলাই দিদিমণি, যে দিদিমণির ঘরের ভাঁড়ারের নিশ্চয়তা নেই, তার কথায়—

"আজ জুটেছে, কাল কী হবে? কালের ঘরে শনি
আমি এখন এই পাড়ায় সেলাই দিদিমণি"

—যে প্রেম ভালোবাসার রঙে উদ্দীপ্ত হয়ে এক অন্য পরিণতির দিকে পৌঁছোনোর সম্ভাবনা ছিল সেই প্রেমই কেবল তার বর্ণ কালো ও আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী না হওয়ার সুবাদে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যায়; এবং শেষ পর্যন্ত নিজের আর্থিক অনটন সত্য হয়ে ওঠে। যে আর্থিক অস্বচ্ছলতা তার বোনকে অন্ধকার জীবন বেছে নিতে বাধ্য করে তার সঙ্গে অপরিসীম বিরূদ্ধ লড়াইয়ে নামে কাহিনির নায়িকা। আসলে কবিতাটির মধ্য দিয়ে একটি মেয়ের জীবনের সামগ্রিক লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়ে ওঠে। আনুমানিক চোদ্দ-পনের বছর জীবন থেকে তার এই সংগ্রামের প্রাক লগ্ন ভূমি কিন্তু সেই মালতী স্কুল। যে স্কুল থেকে এই আখ্যানধর্মী কবিতার প্রোটাগনিস্ট ও অ্যান্টাগোনিস্টের জন্ম, অর্থাৎ নামগোত্রহীন সেই প্রেমিকা কিশোরী মেয়ে ও তার বান্ধবী সুলেখার পরিচিতি। যে সুলেখা হয়ত এই কবিতায় ইঙ্গিতে বলা মেয়েটির প্রেমিক বেণীমাধবের বর্তমান প্রেমিকা।

সুতরাং কবিতাটির সমগ্র বিষয়বস্তু বিচার করে দেখা যায় যে, আলোচ্য কবিতার যে মূল বিষয়বস্তু প্রেম ও প্রেমহীনতার কাহিনি তা মূলত একটি বিদ্যালয়কে আশ্রয় করেই আবর্তিত হয়েছে। মূলত 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'কে কেন্দ্র করে নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর প্রেমের পূর্বরাগ থেকে পরিণতির পথকে অঙ্কন করেছেন কবি অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে। আসলে নামগোত্রহীন এই প্রেমিকা কিশোরীর যেন পরিচয় হয়ে উঠেছে মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসাবেই। একটু গভীর দৃষ্টিতে উপলব্ধি করলে পাওয়া যাবে যে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হবার সুবাদেই এই কিশোরী মেয়েটির মনে প্রেমের স্ফুরণ ঘটে, ফলত এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে এই কিশোরী মেয়ের ব্যর্থ প্রেমের প্রথম পৃষ্ঠপোষক কিন্তু এই মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়। এবার প্রশ্ন হতে পারে বালিকা বিদ্যালয় কেন, এর উত্তরে বলতে হয় নারী মনস্তত্ত্বকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য কবির এই প্রচেষ্টা। আসলে সাধারণ বিদ্যালয়ের মেয়েদের এই অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ সুচারুভাবে হত না। ফলত সবদিক বিবেচনা করে এটা প্রকাশিত যে আলোচ্য 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার মূল কাহিনির পীঠস্থান যেহেতু মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়, এবং এই বিদ্যালয়টিই যেহেতু সম্পূর্ণ কবিতার অন্যতম ধারক তখন একথা অবলীলায় বলা যায় যে কবিতাটির নামকরণ সার্থক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

২.৮ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়ে বাংলার প্রথিতযশা দুই কবি, জীবনানন্দ দাশ ও জয় গোস্বামীর দুটি বিখ্যাত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন' ও 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়'-এর আলোচনা করা হয়েছে। আধুনিক কবিতার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য মানুষের বর্তমান যাপন চিত্রকে তুলে ধরা, তা এই দুই কবিতায় অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছে। আসলে জীবনকে দেখার দু'টি ভিন্ন দৃষ্টি আলোচ্য কবিতা দু'টির মধ্য দিয়ে ভাস্বর। একটিতে জীবন ধ্বনিত হয়েছে জীবনে সব কিছু পেয়েও গতানুগতিকতায় ওষ্ঠাগত প্রাণে নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়ার চিত্র তেমনি আরেকটিতে বর্ণিত হয়েছে প্রেমহীন জীবনের বেদনাবোধ, যে বোধের সঙ্গে সংপৃক্ত হয়ে ঘোষিত হয়েছে সেই প্রেমহীনতার কারণ ও যাপনের বর্তমান পরিস্থিতির সংঘাতময় চিত্র। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না যে কবিতা দু'টিই ভিন্ন দৃষ্টিতে বিশ্বায়নাক্রান্ত পৃথিবীর বাস্তব যাপন চিত্র। যে চিত্রকে অস্বীকার করে নয়, আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে আমাদের প্রতিদিনকার রোজনামচা।

২.৯ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- সাহিত্যে আধুনিকতার উৎস ও স্বরূপ, প্রেক্ষাপট রূপে গৃহীত আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা গ্রহণ।
- জীবনানন্দ দাশের কবি পরিচিতি ও কাব্যকৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নিটোল ধারণা গড়ে উঠলো।
- জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতা 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগিত হওয়া ছোল।
- পরাবাস্তববাদ ও 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টিকে স্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- কবি জয় গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করা সম্ভব হল।
- কবি জয় গোস্বামীর বিখ্যাত কবিতা 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হবেন এবং কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিষয়ে সুষ্ঠ মীমাংসা তুলে ধরা সম্ভব হল।

২.১০ অতিরিক্ত পঠন

দাশ, জীবনানন্দ (১৪১৩ বঙ্গাব্দ); কবিতার ক্লাস; কলকাতা : সিগনেট প্রেস

ডাইসন, কেতকী কুশারী (১৯৯০); শিকড় বাকড়; কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড

সিংহ রায়, জীবেন্দ্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ); আধুনিক বাংলা কবিতা : বিচার ও বিশ্লেষণ; বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মিশ্র, অশোক কুমার (১৪১৯ বঙ্গাব্দ); আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

✓ ২.১১ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর : কবি জীবনানন্দ দাশ রচিত 'আট-বছর আগের একদিন' কবিতাটি 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ..... কবিতাটির মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় একজন সচ্ছল নামগোত্রহীন ব্যক্তি অকস্মাৎ জীবনের সবথেকে মর্মান্তিক চরম সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের তথাকথিত সর্বাঙ্গসুন্দর জীবনকে আত্মহত্যার পথে নিয়ে যায়। .....এইভাবে কবিতার সামগ্রিক বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ২.৪.২ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর : আলোচ্য কবিতার কাহিনি পাঠে আমরা দেখি যে, মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়ের সেই কিশোরী তার কৈশোরকালীন ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতিচারণায় যেমন নিমগ্ন হয়েছে ..... কিন্তু মনে সেসময় নিজের একটি মানুষের সুপ্ত আকাঙ্খাকে জাগিয়ে তুলেছিল দিদিমণির পাশের দিদিমণির বর।..... প্রথম স্তবকে ছিল স্বপ্ন, শেষ স্তবকে আছে কান্না। ....এইভাবে কবিতার সামগ্রিক বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরতে হবে। (দ্রষ্টব্য : ২.৫.২ অংশ)

? ২.১২ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আধুনিক কবিতা হিসাবে কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির যোগ্যতা বিচার করুন।

২। কবি জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটিকে পরাবাস্তববাদী কবিতার আলোকে বিচার করুন।

৩। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর যে স্বরূপ ফুটে উঠেছে তা কবিতার বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে ফুটিয়ে তুলুন।

৪। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার আলোকে কবি জীবনানন্দ দাশের কবি কৃতিত্ব বিচার করুন।

৫। আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিষয়ে দৃষ্টি রেখে আধুনিক কবিতা হিসাবে কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটির যোগ্যতা বিচার করুন।

৬। প্রেম বিষয়ক কবিতা হিসাবে কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটি কতখানি সার্থক তা কবিতাটির বিষয়বস্তুর আলোকে আলোচনা করুন।

৭। কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করুন।

৮। 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতাটির আলোকে কবি জয় গোস্বামীর কৃতিত্ব বিচার করুন।

৯। প্রেম ও অস্তিত্বের সংগ্রাম কবি জয় গোস্বামীর 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' কবিতায় যেভাবে বৈপরীত্য নির্মাণ করেছে তা উদাহরণ সহকারে আলোচনা করুন।

*** *** ***